সাত নম্বর রাউডন স্ট্রিট
তসলিমা নাসরিন

সাত নম্বর রাউডন স্ট্রিটের বাড়িটি আমাকে শেষ অবধি ছাড়তে হল। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী ছিল! গত দশ মাস ধরে বাড়িটিতে না বাস করতে পারলেও বাড়িটির ভাড়া দিয়ে যাচ্ছিলাম। আশা ছিল, একদিন হয়তো ফিরতে পারবো, কোনও একদিন হয়তো প্রিয় কলকাতায় আবার আগের মতো জীবন যাপন করতে পারবো। বাড়িটি তো শুধু বাড়ি ছিল না, বাড়িটি ছিল আমার হারিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ। বাড়িটি ছিল আমার মাতৃভাষা। জন্ম থেকে যে পরিবেশ প্রতিবেশ জল হাওয়া আমাকে মানুষ করেছে, তা। বাড়িটি ছিল আমার মায়ের ধনেখালি শাড়ির আঁচল, নিকোনো উঠোন, বাড়িটি ছিল তালপাতার পাখা, বাড়িটি ছিল স্বপ্ন। বাংলা থেকে দীর্ঘকাল নির্বাসন আমাকে কাঁদিয়েছে কী কম! পরবাসের বরফে ডুবে থেকে থেকে আমার মৃত্যু হচ্ছিল। সাত নম্বর রাউডন স্ট্রিটের খোলা বারান্দাঅলা ওই বাড়িটি ছিল আমার বেঁচে ওঠা।

দেশ থেকে নির্বাসিত আজ চৌদ্দ বছর। যেদিন ভারতে প্রবেশ করার অনুমতি মিলল, সেদিন দেরি না করে কলকাতায় উড়ে এসেছি। যেন দেশে ফিরেছি, নিজের দেশে। তখন হোটেলে উঠতে হত। পর্যটকের ভিসা নিয়ে কয়েক সপ্তাহের জন্য থেকে গিয়েছি কলকাতায়। কলকাতা আমাকে একটু একটু করে বুকের ভেতর পুষে রাখা স্বপ্নটি বেড়ে উঠতে দেখেছে। কয়েক বছর কলকাতায় যাওয়া আসা করার পর সেই অনুমতিটি মিললো একদিন, কলকাতায় বসবাসের অনুমতি মিলল। ওই অনুমতিটি হাতে নিয়ে বিমান বন্দর থেকে সোজা আমি যে বাড়িটিতে এসে উঠেছিলাম, সেই বাড়িটিই সাত নম্বর রাউডন স্ট্রিট। বাড়ি ভাড়া নেওয়াও অভিনব। কোনও হোটেলে আর উঠবো না, এ সিদ্ধান্তটি ছিলই। বন্ধুরা কসবার দিকে একটি বাড়ি ঠিক করে রেখেছিল আমার জন্য। ঢুকেই পছন্দ হয়নি। কসবা থেকে বেরিয়ে বাড়ি ভাড়া দেবে এমন দুএকটি ফোন নম্বর পেলাম এক বন্ধুর কাছে। প্রথম নম্বরে ফোন করে বাড়িঅলার সঙ্গে ফেনে কথা বলে রাউডন স্ট্রিটের রংচটা দেওয়াল আর ধুলোময় মেঝের খাঁ খাঁ করা খালি বাড়িটিতে ঢুকেই বলেছিলাম বাহ। যেমন চেয়েছিলাম, ঠিক তেমন। অথবা হয়তো তারও চেয়ে বেশি। ভাড়া আকাশ ছোঁয়া। ওতেও গা করিনি। আমি এমনই, পছন্দ হলে আর পিছনে তাকাই না।

যেদিন ঢুকেছি সেদিনই পার্ক স্ট্রিটে ঘুরে ঘুরে এক বিকেলেই কিনে নিলাম প্রায় অনেক কিছু। বাড়িতে রং শুরু হল দুদিন পর। ঘরে ঘরে মই, বইপত্র জামাকাপড়গুলোয় ঢাকনা দেওয়া, গায়ের ওপর চলতে ফিরতে টুপ টুপ করে ঝরে পড়ছে সাদা রং, নাওয়া খাওয়া বন্ধ, মোটেও এতে অসুবিধে বোধ করিনি, বরং রংএর মিস্ত্রিদের জীবনকাহিনী শুনে সময় কাটাতাম। রংএর কাজ শেষ হয়ে গেলেও মিস্ত্রিদের ঠিকাদার রওশন আলী আসতেন। নতুন কোনও কাজের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করতে। আমার বাড়ির দরজা কারও জন্য কখনও বন্ধ ছিল না। বাড়িতে খুব বড় বড় নামি দামি লোকের আনাগোনা কখনও ছিল না। ছিল মঙ্গলা, আরতি, লক্ষী, সরস্বতীর মতো কঠোর জীবন

সংগ্রামে ব্যস্ত মেয়েদের অবাধ যাতায়াত। বাংলাদেশে আমার শান্তিনগরের বাড়িতে যা হত, কবি লেখকদের সঙ্গে প্রায় বিকেলেই আড্ডা আলোচনার আসর বসতো, কলকাতায় বাস করার আগে আমার মনে হত ওরকমই বুঝি হবে। ওরকম কিছুই হয়নি। একেবারেই যে কবি লেখক শিল্পীদের পায়ের ধুলো পড়েনি তা নয়। তবে বেশির ভাগই প্রান্তিক মানুষের ধুলো, বেশির ভাগই সমাজের সাধারণ মানুষের আনাগোনা। অচেনা, অখ্যাতদের ভিড়ই ছিল বেশি। লেখকদের মধ্যে প্রায়ই আসতেন শিব নারায়ণ রায়, মাঝে মাঝে অম্লান দত্ত।

কলকাতার এই বাড়িটিতে ঢুকেই মুগ্ধ হয়নি এমন মানুষ কমই আছে। বারান্দার দরজা রাত দিন কখনও লাগাতাম না। বিশাল কাচের দরজা খোলাই থাকতো। শীত গ্রীস্ম যেত, খোলাই। ঢাকায় যে বাড়িটি ছিল আমার, বাড়িটি সাজানো মাত্র শেষ হয়েছিল, তখনই তো সব ফেলে দেশ ছাড়তে হয়েছিল। নিজের একটা বাড়ি আমার কখনও হয়নি। বিদেশের বিভিন্ন দেশে যা হয়েছে, সেসবকে অস্থায়ী আবাস বলেই বোধ হত, কোনও বাড়ি বলে বা নিজের বলে কিছুই কোনওদিন বোধ হয়নি। তাই কলকাতায় যেদিন অনুমতি পেলাম থাকার, বিদেশের সব কিছু ফেলে ছুটে এলাম। যেন ঘরে ফিরলাম, বাড়ি ফিরলাম। সাত নম্বর রাউডন স্ট্রিটে আমার স্বপ্নের জীবন শুরু হল। বারান্দার দড়িতে ভিজে কাপড় মেলে দিতাম, বাতাসে দুলে দুলে কাপড় শুকোতো। লেখার ঘরে বসে ভেসে আসা মশলার রান্নার ঘ্রাণ পেতাম। গোটা বাংলাদেশকেই আমি পেয়ে যেতাম। ঘরের কাছে ঘর, সেই ঘর থেকেই টের পাওয়া যায় আরেক ঘরের স্বাদ গন্ধ স্বর। বিদেশ আমার শৈশব কৈশোর আর যৌবন থেকে টান মেরে আমাকে আলোকবর্ষ দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। কলকাতায় এসে আমি আমার হারিয়ে যাওয়া অতীতকে হাতের কাছে পেয়েছি। হাসনুহানার ঘ্রাণ গোটা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়তো। সেই আমার শৈশবের মতো। খুঁজে খুঁজে হাসনুহানার চারা কিনেছিলাম চারটে। বারান্দার টবে লাগিয়েছিলাম। চারাগুলো বড় হল, ফুল ফুটলো। ফুলের ঘ্রাণ আমাকে পাগল করে দিত। যে রাতে ফুল ফুটতো, শোবার ঘরে শিয়রের কাছে এনে রাখতাম টবগুলো। ঘ্রাণ পেতে পেতে যে ঘুম ঘুমোতাম, সে ঘুম যে কী প্রশান্তির, হাসনুহানার ঘ্রাণের সঙ্গে যার শৈশব কৈশোর কাটেনি, সে বুঝবে না।

প্রায় প্রতিদিনই চলে যেতাম যদুবাবুর বাজারে। দেখতে পেলেই দিদি দিদি বলে সবাই ছুটে আসতো চাল ডালের দোকানী, তরকারিঅলা, মাছঅলা, মাছ কাটার ছেলেগুলো, মুরগিঅলা, ঝাঁকাঅলা। যে বেড়ালের বাচ্চাটিকে মাছের বাজার থেকে তুলে এনেছিলাম, সে তো দিনে দিনে আমার আদরের কন্যা হয়ে উঠেছে। সত্যিকার মাছে ভাতে বাঙালি আর কাকে বলা যায়! প্রতিদিন ছ সাত রকম মাছ রান্না হত বাড়িতে। নিমন্ত্রিত তো বটেই, অনিমন্ত্রিতরাও না খেয়ে কেউ দুপুরে বা রাতে যেতে পারেনি। মানুষকে খাওয়াতে খুব আনন্দ হত আমার। বন্ধুরা বলতো, *এ একেবারে বাংলাদেশি ব্যাপার।* আন্তরিকতা, আতিথেয়তা আজকাল সব দেশ থেকেই হারিয়ে যেতে বসেছে। এমনকী, বাংলাদেশ থেকেও। কিছু কিছু মানুষের, সে যে দেশেই তাদের জন্ম হোক না কেন, হৃদয় বলে এখনও কিছু আছে। আতিথেয়তার সঙ্গে কোনও দেশের সম্পর্ক নেই, আছে হৃদয়ের সম্পর্ক।

পাঠক ছিল আমার, ক্রমশ বন্ধু হয়ে উঠেছে, এমন সংখ্যা নেহাত কম নয়। হই হই করে তারাই মাতিয়ে রাখতো বাড়ি। দেশ থেকে আমার আত্মীয়রা এসে রাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে উঠতো। কখনও ভাবিনি কলকাতা আমাকে ছেড়ে যেতে হবে কোনওদিন।

বাংলাদেশ থেকে নির্বাসনে যেতে হয়েছিল সেই চৌদ্দ বছর আগে। তখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা কী যে দুঃখ করেছে, বড় আহা আহা করেছে, কত মানুষের চোখের জল ঝরেছে, তখন কি কেউ জানতো পশ্চিমবঙ্গ থেকেও একদিন আমাকে নির্বাসনে যেতে হবে!

বাংলাদেশ থেকে যখন নির্বাসনে যেতে হয়েছিল, তখন আমি এক প্রতিবাদী লেখক, আপোসহীন অস্তিত্ব, কঠোর নারীবাদী, রুখে ওঠা ফুঁসে ওঠা প্রাণ। পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাসন হল এক অসহায়, দেশহীন, আত্মীয়হীন, স্বজনহীন এমনকী প্রয়োজনে আপোসও করতে পারে এমন এক নিরাশ্রয় নারীর।

কলকাতার বাড়িটি নিয়ে লিখেছিলাম একটা কবিতা। নভেম্বরের বাইশ তারিখে কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল। কবিতা লিখেছিলাম সেই থেকে তিন মাস পর।

আমার কলকাতার বাড়ি

বাড়িটা তুই, আছিস কেমন?
তোর বুঝি খুব একলা লাগে?
আমারও তো, আমারও খুব।
রাত্তিরে কি ভয় করে না?
জানলাগুলো হঠাৎ করে
ধরাস করে খুলে গেলে?
কেউ এসে কি দরজা নাড়ে?
ধুলোয় ধুসর ঘরবারান্দায়
কেউ ঢোকে কি, ভয় জাগে যে?
চোর ডাকাতের বাড় বেড়েছে!
নাকি হাওয়াই ঢোকে, ঝড়ো হাওয়া!
হাওয়াই বা কোথায় এখন,
সম্ভবত আমিই ঢুকি,
মনে মনে আমিই বোধহয়।
হেঁটে বেড়াই ঘরগুলোতে,
অন্ধকারে চিনতে পারিস!
পায়ের আওয়াজ বুঝিস কিছু?

বাড়িটা তুই, লেখার ঘরটা দেখে রাখিস,
সবকিছুই তো ওই ঘরে রে,
জীবনটাই লেখার জীবন,
ন-আলমারি বইপত্তর,
লেখাপড়ার দুনিয়াটা,
ওসব ছেড়ে ভালো থাকি!
মনে মনে আমিই বোধহয়
অশরীরি ঘুরি ফিরি
ফেলে আসা ঘরদুয়ারে
চোখের জল ফেলে আসি!
বারান্দার গাছগুলোতে
জল যে দেবে, কেউ তো নেই!
চোখের জলে বাঁচবে না গাছ?
চোখে আমার এক নদী জল,
এক সমুদ্র চাস যদি বল, পাঠিয়ে দেব,
বাড়িটা তুই, বেঁচে থাকিস।

তোকে ছাড়া নির্বাসনে
এক মুহূর্ত মন বসে না,
বেড়ালটাও বাড়ি নেই,
খাঁ খাঁ করছে বাড়ির ভেতর,
ধুলোয় তুই ডুবে আছিস,
আঁচল দিয়ে মুছে দেব,
চোখের জলে ধুয়ে দেব,
অপেক্ষা কর, বাড়িটা তুই।
তুই কি আর শুধুই বাড়ি।
তুই তো আমার হারানো দেশ।
তুই তো আমার মাতৃভাষা।
তুই কি আর শুধুই বাড়ি!
এক যুগেরও বেশি সময়
বুকের ভেতর তোকে লালন

করেছি তুই জানিস তো সব।
দীর্ঘকালের স্বপ্ন তুই,
স্বপ্ন বলেই তোকে ডাকি,

বাড়িটা তুই, বেঁচে থাকিস,
আমায় একটু বাঁচিয়ে রাখিস।
(২২.০২.০৮)

তখনও জানতাম যে আমি ফিরতে পারবো একদিন কলকাতায়, একদিন বাড়িতে। আবার আগের মতো সব হবে, আগের মতো জীবন যাপন। আগের মতো আড্ডা। আগের মতো বারান্দায় কাপড় শুকোবে, রান্নাঘর থেকে ভেসে আসবে মশলার ঘ্রাণ। গল্প করতে আসবেন সৌগত রায়, ডলি রায়, রঞ্জন বন্দোপাধ্যায়। কখনও কখনও জয় গোস্বামী। হঠাৎ বুদ্ধদেব গুহ। আসবেন দীপংকর সেনগুপ্ত, প্রশান্ত রায়, শিবানী মুখোপাধ্যায়, মোজাফফর হোসেন, গিয়াসউদ্দিন। আসবেন পুরো ফুলের দোকান তুলে নিয়ে অনিল দত্ত। স্বাতী, স্বপ্না, উস্রি, শর্মিলা, শর্মিষ্ঠা, অশেষ, মুনা হই হই করে মাতিয়ে রাখবে পুরো বাড়ি। ভালোবাসা আমি কম পাইনি। ভালোবাসা দিয়েওছি কি কম? পৃথিবীর কোনও শহর নিয়ে আমি কবিতা লিখিনি, এমনকী ঢাকা বা ময়মনসিংহ নিয়েও লিখিনি এত, লিখেছি কলকাতা নিয়ে একশ কবিতা। কলকাতা নিয়ে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ নিবন্ধ। কেন? মাঝে মাঝে ভাবি। বেশি ভালোবাসলেই বুঝি এই হয়। নিদ্বির্ধায় ফতোয়া হয়, ইটপাটকেল ছুড়ে গন্ডগোল পাকানো হয়। বেশি ভালোবাসলেই বোধহয় কাঁদতে হয়।

স্বপ্ন চুরচুর করে ভেঙে পড়লো। এতদিনের বাড়িটা শেষ পর্যন্ত আমায় ছাড়তে হলো। ন মাস বাড়িটি খালি পড়ে ছিল। তারপরও ছিল। আশা ছিল। পুষে রাখা আশাটি যখন তিরবিদ্ধ হলো, বাড়িটিকে গুটোতে হল। গুডবাই কলকাতা বলবো, নাকি বলবো বিদায় বাংলা! কিছুই বলিনি। স্তব্ধ হয়ে ছিলাম। স্তব্ধ হয়ে আছি। বন্ধুরাই আমার হয়ে বাড়িটি ছেড়ে দিল। পাঠিয়ে দিল যা কিছু ছিল তার সব না হলেও প্রায় সব। আমার আশা ভরসার কবর ওখানেই দিয়ে দিল ওরা। সাত নম্বর রাউডন স্ট্রিট থেকে যখন বাইশে নভেম্বর বেরোতে হচ্ছিল, দুদিনের জন্য জয়পুরে না গেলেই নয়,. তখন কি আমি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম, ওই যাওয়াই আমার শেষ যাওয়া হবে? ভাবিনি। আমার বন্ধুরা যারা বাড়িতে ছিল, চোখের সামনে আমাকে হুড়মুড় করে বিমান বন্দরে চলে যেতে দেখেছে, কেউই ভাবেনি। ফিরে আসবো, আজ না হোক কাল, এরকমই জানতো সবাই। ফেরা যে আর কোনওদিন হবে না, তা আমি হলফ করে বলতে পারি, একুশে নভেম্বরের কোনও দুর্বৃত্তও ভাবেনি।
এই যে ছোট এক মানুষের ছোট এক স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেল, কার দোষে? কী দোষে? মাঝে মাঝে কোনও প্রশ্নের আমি উত্তর খুঁজে পাই না। কারও কারও জীবনে হয়তো কোনও স্বপ্ন থাকতে নেই,

ঠিকানা থাকতে নেই। অবকাশ, ১৮ টি এন রায় রোড ময়মনসিংহ। ১/৯০৪ ইস্টার্ন পয়েন্ট, ৮,৯ শান্তিনগর, ঢাকা। সাত নম্বর রাউডন স্ট্রিট, কলকাতা। এই ঠিকানাগুলো কোনও এক অদৃশ্য হাত আমার জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে। আমি আজ ঠিকানাহীন মানুষ। ঘরহীন উদ্বাস্তু।

মানুষ আর বাঁচে কদ্দিন! শেষ জীবনটুকু বাংলায় বাস করবো, সাধ ছিল। এই সাধটুকু পুরন হলো না। অনেকে বুঝে পায় না পশ্চিমের এত দেশ থাকতে বাংলায় ফিরতে কেন চাই। এই চাওয়ার কারণটা যারা বোঝে না, তাদের দিনভর রাতভর বোঝালেও তারা যে বুঝবে না, এ আমার বোঝা হয়ে গেছে। তারা বলে, *সবাই ওপর দিকে যেতে চায়, তুমি এত নিচের দিকে নামতে চাও কেন?*

আমি বলি, *ওপর আমার দেখা হয়ে গেছে। নিচে শেকড় বলেই নিচে নামি।*

তারা প্রশ্ন করে, *আজকাল কি শেকড়ের তোয়াককা কেউ করে নাকি?*

আমি উত্তর দিই, *করে না হয়তো। কিন্তু আমি করি। আসলে ওপরের যাওয়ার আমার আগ্রহ কোনওকালেই ছিল না। আমি নিচের মানুষ, সবার নিচে সবহারাদের মাঝে থাকতেই ভালোবাসি।*

কলকাতায় যে কেবল সুখ দিয়েছে সবাই, ভালোবেসেছে কেবল তা নয়। প্রচুর স্বার্থান্বেষী., সামনে ভালো আড়ালে মন্দ, ভীতু ভীরু, হিংসুক, কুয়ের ব্যাঙ গোছের, সুসময়ের-বন্ধু দুঃসময়ের-নয়দের সঙ্গেও চলতে ফিরতে হয়েছে। প্রতিবেশিদের কেউ কেউ মহা বিরক্ত করতো, কেয়ার টেকার জান হারাম করে দিত, বাড়িতে মুহূমুর্হূ চুরি হত --- কিছুকেই মূল্য দিইনি। ভুলে গিয়েছি। ভালোবাসায় সৌহার্দে প্রীতিতে অকৃত্রিম হাসিতে ভরিয়ে দিয়েছি শত্রুর আঙিনাও। হারিয়ে যাওয়া বাংলা আমি ফিরে পেয়েছি, এত বড় সুখের কাছে তুচ্ছ হয়ে যেত বাকি সব।

কলকাতার এই প্রিয় ঠিকানাটি আমাকে ত্যাগ করতে হল। এই ঠিকানাটি এখন আর আমার নয়। নিজের হাতে সাজানো সবকিছুকে যখন বাড়ি থেকে উপড়ে তোলা হয়েছে, স্বপ্নের পত্র পুস্প ডালপালা শেকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে ছিড়ে ছিড়ে ফেলে আসা হয়েছে কলকাতার পথে পথে। আমার স্বপ্ন সাধ তো বড় কিছু নয়। এরকম কত মানুষের কত স্বপ্নই তো ভেঙে যাচ্ছে পুড়ে যাচ্ছে খাক হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। তবে অন্যায় না করে ঠিকানা হারানো, রাজ্য হারানো, দেশ হারানো, বন্ধু হারানোর কষ্ট বড় ভয়ংকর। অন্যরা অন্যায় করে, হুমকি দেয়, ছিড়ে খেতে চায়, পিষে ফেলতে চায়, আর তাদের অন্যায়ের শাস্তি পেতে হয় আমাকে। সকল গৃহ হারাতে হয় আমাকে।

সাত নম্বর রাউডন স্ট্রিটকে এখনও খুব জীবন্ত মনে হয়। যেন ইচ্ছে করলেই আমি আবার সেই জীবনে ফিরতে পারবো। কলকাতায় যদি ফেরার এবং বাস করার অনুমতি পাই কখনও, তবে যে বাড়িতে বাস করি না কেন, খোলা একটি বারান্দা যেন থাকে যেখানে রোদ্দুর এসে পড়বে, দড়িতে ঝুলে থাকা কাপড়গুলো দুলে দুলে শুকোবে, যেন হাসনুহানা ফুটে থাকে বারান্দার টবে, তার ঘ্রাণ আমার শৈশবকে সেই সুদূর অতীত থেকে জাদুবলে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে। এত আঘাত পাই, এত রক্তাক্ত হই, তবুও স্বপ্নকে জলে ডুবিয়ে দিতে পারিনা। শক্ত মুঠোয় স্বপ্নের আঁচল ধরে মাঝরাত্তিরের অকূল দরিয়াতেও দাঁড়িয়ে থাকি।